মালঞ্চ

অতিথি সংখ্যা

১৪২৩

ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত

লেখা-

পুলক দত্ত
মৌসুমী ভৌমিক
অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক
শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কীর্তনীয়া দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়
সায়নদীপ ব্যানার্জী
মিলন মিত্র ঠাকুর

মালঞ্চ

(ঐতিহ্যবাহী ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ির বার্ষিক পত্রিকা)

৩য় বর্ষ অতিথি সংখ্যা

সম্পাদনা, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

মিলন মিত্র ঠাকুর

মালঞ্চ পত্রিকা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত

সৌজন্যে : শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেবা সমিতি

ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ি।

শুভ জন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৪২৩

মালঞ্চ
৩য় বর্ষ অতিথি সংখ্যা ১৪২৩

যোগাযোগ :
সম্পাদক, (মালঞ্চ), ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ি
পোঃ-রাণীপাথর, জেলা-বীরভূম
মোঃ-৯৪৭৪০৮০৫১৪

অক্ষর বিন্যাস :
সন্দীপ হাজরা, কালীমোহনপল্লী,
বোলপুর। মোঃ-৯৬১৪৫১৯৩৮১

মুদ্রণ :
বেনুদীপা অফসেট প্রিন্টিং
বোলপুর। মোঃ-৮৫১৪০০৫২১২

সৌজন্য মূল্য : ত্রিশ টাকা

সম্পাদকীয়

মালঞ্চ অতিথি সংখ্যা ১৪২৩ প্রকাশিত হ'ল। প্রথম সংখ্যা ১৪২১ প্রকাশ করার সময় আমরা ভেবেছিলাম আমাদের ঠাকুরবাড়ির কথা আমাদের পরিবারের কথা আমরাই লিখব এবং পত্রিকাটি আমাদের পারিবারিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ হবে। সেইজন্য আমাদের আদি পুরুষ নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর তাঁকেই প্রচ্ছদ করে আমরা নৃসিংহবল্লভ সংখ্যা করেছি। ঠিক তার পরের বছর ১৪২২ আমাদের দুর্ভোগের বছর আমাদের মন খারাপের বছর আমাদের সমগ্র মিত্র ঠাকুর পরিবারের শোক পালনের বছর তার কারণ আমাদের সবার প্রিয়, প্রিয়জন, ভ্রাতৃসম, সন্তানসম, মিত্র ঠাকুর ঘরানার অত্যন্ত প্রভাবশালী, প্রতিভাধর কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ মিত্র ঠাকুর-এর জীবনাবসান কীর্তন আসরে ঘটল একেবারে অকস্মাৎ। স্বভাবতই আমাদের আবেগ ১৪২২ 'মালঞ্চ'-কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করেছি। এরপর ১৪২৩ আমাদের কাছে সুসময় হয়ে এলো। 'দ্য ট্রাভেলিং আর্কাইভ' কোলকাতা হ'তে মৌসুমী ভৌমিক ও সুকান্ত মজুমদার তাঁরা এলেন এবং সঙ্গে করে আমাদের জন্য নিয়ে এলেন আমাদের পরিবারের পুরনো দিনের (১৯৩৩ সালের ১৯৫৪ সালের) গান-বাজনার সংগ্রহ। এবং তাঁরা জানালেন সুদূর নেদারল্যাণ্ড হ'তে 'আর্নল্ড বাকে' নামে এক সাহেব ১৯৩৩ সালে আমাদের ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন এবং সেদিনের মিত্র ঠাকুরদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, সেসব কথা তিনি তাঁর মাকে চিঠিতে লিখেছেন। এরপর মৌসুমী ও সুকান্ত শান্তিনিকেতনে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন-'টাইম আপন টাইম' সেই প্রদর্শনীতে তাঁদের সংগ্রহ মিত্র ঠাকুরদের কীর্তনগান ও শ্রীখোল বাজনা প্রদর্শনীর একটা অংশ হিসাবে ছিল। শুধু তাই নয় তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন মনোহরশাহী ময়নাডাল ঘরানার কীর্তনীয়া শ্রী নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুর, মৃদঙ্গবাদক শ্রী সচ্চিদানন্দ মিত্র ঠাকুর ও সঙ্গে কণ্ঠ সহযোগী শ্রী সঞ্জীব মিত্র ঠাকুর, শ্রী অঞ্জন মিত্র ঠাকুরদের। যার ফলে সেখানের অনেক গুণী মানুষেরা ময়নাডাল মিত্র ঠাকুর ঘরানার সাথে পরিচয় করলেন। যেমনটি আমার অগ্রজ প্রতিম বন্ধু শান্তিনিকেতনের গবেষক শিল্পী শ্রী পুলক দত্ত যিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনে বহুদিন ধরে অধ্যাপনা করেছেন তিনি ময়নাডালের গান বাজনায় মোহিত হলেন যদিও ময়নাডাল-এর সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ১৯৮০ সালে জন্মাষ্টমীর সময় সেই সময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর জাপানীজ বন্ধু মাসায়ুকি ওনিশি-কে। সেই স্মৃতিকে তিনি পুনরায় উজ্জীবিত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ময়নাডালে এলেন, উদ্দেশ্য সরাসরি

আলাপচারিতায় এখানের কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদকের কাছ হতে মনোহরশাহী ময়নাডাল ঘরানার বৈশিষ্ট্যগুলি জানার।

এই যে এইসময়ে এতসব মানুষদের আমরা পেলাম যাঁরা ময়নাডালের গান বাজনার ঐতিহ্যকে ভালবাসেন শ্রদ্ধা করেন। তখনি আমার ভিতর এবারের 'মালঞ্চ'-এর বিষয় ভাবন রূপ পেল। ঠিক করলাম আমাদের পরিবারের বাইরে হতে যাঁরা আমাদের পরিবারের গান বাজনাকে সম্মান করেন তাঁদের ভালো লাগার কথা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে এবারের 'মালঞ্চ'– ১৪২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এবং তাঁরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কথ বলবেন তার জন্য আমাদের গর্ব-বোধ হবে বৈকি।

মালঞ্চ -১৪২৩,যাঁদের লেখায় প্রস্ফুটিত হল তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের ঠাকুর বাড়ি ও মালঞ্চ কমিটির হয়ে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

—মিলন মিত্র ঠাকুর
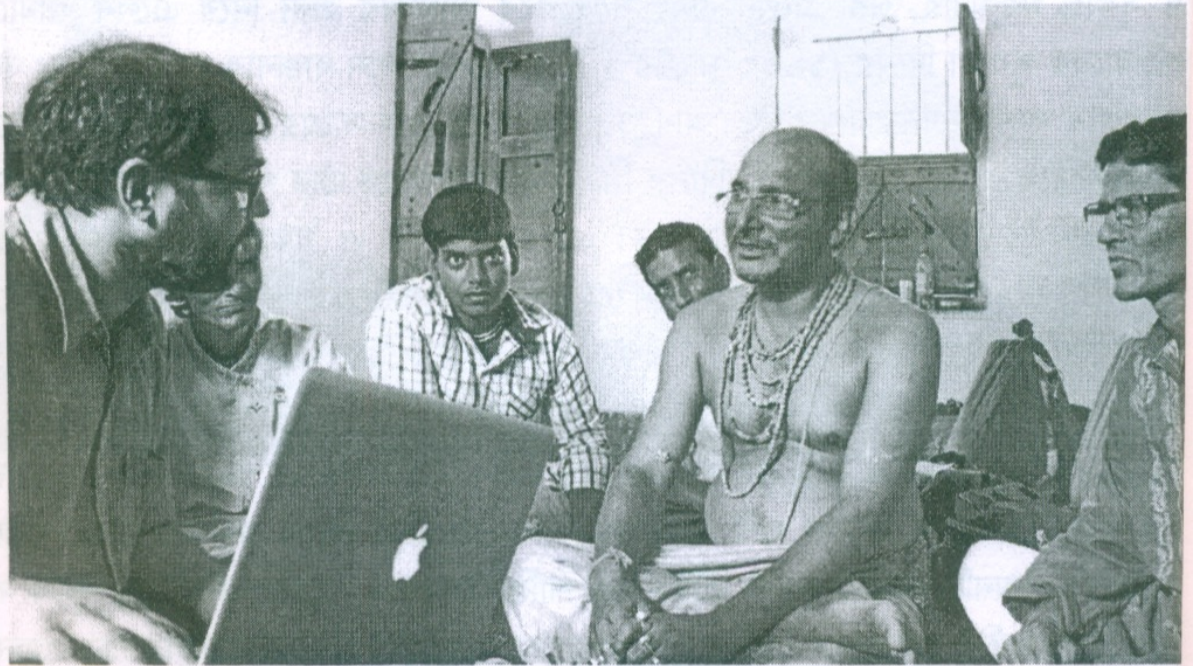
২০১৪ সালের অতিথি : দ্য ট্র্যাভেলিং আর্কাইভ-এর সুকান্ত মজুমদার কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ মি ঠাকুরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন।

সূচীপত্র

শান্তিনিকেতনে আর্নল্ড এবং কর্নেলিয়া বাকে, ১৯২৫-২৯ মধ্যে তোলা ছবি। মুল ফটোগ্রাফটি রাখা আছে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভ-এ।
প্রসঙ্গত আর্নল্ড বাকে **১৯৩৩** সালে আমাদের ঠাকুর বাড়িতে অতিথি ছিলেন।

ফটো সৌজন্যে : দ্য ট্র্যাভেলিং আর্কাইভ - কোলকাতা।

শ্রুতিমাধুরী : বাঙলা কীর্তন শোনার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা

পুলক দত্ত

নরওয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এন.টি.এন.ইউ)আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক একটি উৎসবে যোগ দিতে, ২০১১সালের নভেম্বর মাসে পৌঁছেছিলাম নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ত্রনধিয়ামে। শহরটি এত ছোট যে পায়ে হেঁটেই গোটা শহর ঘোরা যায়। পয়লা অক্টোবর স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে হোটেল থেকে রওনা হলাম মার্কেট স্কোয়্যারের দিকে। সেখানে পথের ধারে ছোট একটা মঞ্চ বানানো হয়েছে, সদ্য শুরু হয়েছে ভারতনাট্যম নাচ, পাশেই প্যাণ্ডেলের নিচে কিছু ভারতীয় মহিলা মেঝেতে এঁকে চলেছেন রঙ্গোলি - এমনকি ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য প্রচারে ওই খোলা মঞ্চেই বিদেশি মেয়েদের শাড়ি পরা শেখানোর ব্যবস্থাও তৈরি।

এই কাণ্ড কারখানা দেখে বিরক্ত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম - যাব কোথায়! দেখি রাস্তার ধারে দুই সাহেব আর এক মেমসাহেব শাড়ি-ধুতি-জ্যাকেট পরে খোল-করতাল নিয়ে নামগান করে চলেছেন। দুই সাহেব, একজনের গলায় ঝুলছে ফাইবার গ্লাসের নীল রঙের খোল, অন্য জনের হাতে খঞ্জনী আর মেমসাহেব তাঁর লাল কৌটো থেকে মিষ্টি বের করে পথ চলতি সকলকে খাইয়ে নিজেকে এবং সকলকেই খুশি করে চলেছেন।

ত্রনধিয়াম, নরওয়ে ২০১১

নাম ভাব নাম চিন্তা নাম কর সার।
নাম বিনা এ জগতে গতি নাহি আর।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে নাম সংকীর্তনের জন্মলগ্নেই এমন প্রত্যয় ছিল যে,

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

কোথায় নদিয়া আর কোথায় ত্রনধিয়াম! পাঁচশো বছরের ব্যবধানে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছল নাম সংকীর্তনের মাহাত্ম্য

দুই

যে সময়ে বাঙলা বহু বিরোধী দর্শন, সম্প্রদায়, জীবনচর্যা ও আচরণে বিভক্ত, সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বাণী নিয়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাঙালীর সঙ্ঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে চৈতন্যদেব গণমুখী যে ধার্মিক-সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তাতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল নাম কীর্তন। আহ্বান আর প্রেমের মন্ত্রেই সমস্ত স্তর ভেদ করে, সকল বিভেদ-বিদ্বেষ পার করে সকলকে এক সমবেত আন্দোলনে জড়ো করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান চালিকা শক্তি - বাঙালী জীবনে, মননে, সমাজে এমন কোনো স্তর বা কোণ ছিল না যেখানে এই প্রেমের ঢেউ গিয়ে পৌঁছায় নি। শুধু বাংলাই নয়, এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনদর্শন বিকশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য আরো অনেক অঞ্চলেই। সামগ্রিক এই জীবনদর্শনের একটি অংশ হ'ল কীর্তন গান। এই জীবনদর্শন ও জীবনচর্যাই নির্মাণ করেছিল কীর্তনের বিশিষ্ট এই রূপ, বাঙালীর সাঙ্গীতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছিল কীর্তনের সচল সজীব রূপের মধ্যে।

চৈতন্য পূর্ববর্তী বহু বিভক্ত সমাজ ফিরে আসতে সময় নেয় নি বেশি - চৈতন্য পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজই ভেঙে যায় বিভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায়ে। এই রকম দার্শনিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক ভাঙাগড়ার মধ্যেই দীর্ঘ কয়েক শো বছর ধরে চলে কীর্তনের নির্মাণ। আজকে যখন আমরা আহ্বান আর প্রেমের বদলে আহরণ আর বিদ্বেষকেই করেছি জীবনের ভিত্তিভূমি, যখন 'নাম' গানের স্থান দখল করেছে 'আমি' গান - কেমন করে বেঁচে থাকতে পারে কীর্তনের চর্চা আজকের এই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজে ? গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অথবা জীবনচর্যা তার তাৎপর্য হারিয়েছে কয়েক শো বছর আগেই, অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মজাত বাংলা কীর্তনের ধারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আজও সজীব। কীর্তনের চর্চা সঙ্কুচিত হয়েছে, সঙ্কীর্ণ হয়েছে তবু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। যায়নি, তার কারণ হয়তো এই যে সহজ, অনাড়ম্বর, ভক্তি রসে ভরা এক জীবনযাপনের দীর্ঘ ঐতিহ্য আজও কিছু কিছু জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে - নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়াতেই তাঁদের আনন্দ, জীবনের সার্থকতা।

তিন

এমনই একটি পরিবার বীরভূমের ময়নাডালের মিত্রঠাকুর পরিবার। গত ১৫ মার্চ, ২০১৬ শান্তিনিকেতনে নন্দন বাড়ির দোতলায়, জানালাহীন ঠাণ্ডা ঘরে ছোট্টো একটা আসরে বসে এই

পরিবারেরই সচ্চিদানন্দ ও নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুরের গান-বাজনা শোনার সুযোগ হ'ল। দ্য ট্রাভেলিং আর্কাইভ আয়োজিত 'টাইম আপন টাইম' প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে অল্প কিছু শ্রোতার উপস্থিতিতে তাঁরা সেদিন তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। একটি আখ্যানকে সময়ের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করার অপূর্ব এই সাঙ্গীতিক শৈলী সেদিন আসরের পরেও দীর্ঘক্ষণ মনকে এক বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই শৈলী দীর্ঘদিনের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল : মঙ্গলগান, পাঁচালি, রামায়ণগান ইত্যাদি গানের আসরেও বহুবার এই শৈলীর যাদুকরি প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছি। কীর্তনে আমার না আছে কোন তালিম না আছে এর সঙ্গীত-তত্ত্বের ওপর কোন অধিকার।সঙ্গীতে আগ্রহী একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে গল্প বলার আর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার এই সাঙ্গীতিক রূপের চলনে যা কিছু এই আসরে উপভোগ করেছি, এ-লেখা তারই বিবরণ - মূল্যায়ন নয়।

উল্লেখ্য এই যে আসরে কোনো সুরের যন্ত্র ছিল না। নিজের গলার বিস্তৃতি অনুযায়ী গায়ক একেবারে ঠিক সুরে গান শুরু করলেন কোনরকম সুরের যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। বিলম্বিত তালের গান আর সঙ্গে লয়ের রাজ্যে খোলের আনায়াস ভ্রমণ! যেমনি তার চলনের দৃঢ়তা তেমনি স্পষ্ট তার বাণী, ধ্বনির গভীরতা। তারই সঙ্গে স্বরে স্থিত অবিচলিত কণ্ঠধ্বনি, কখনো গমক, মীড় কখনো লীলায়িত তার গতি। শরীরের কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার পরিকল্পিত সমন্বয় এই ধ্বনির উৎস - যেমনি তার উচ্চারণের শুদ্ধতা, তেমনি তার ধ্বনির ব্যাপ্তি। এই দুই ধরণের ধ্বনি, আখ্যানের বৈশিষ্ট অনুযারী বিন্যস্ত হতে থাকল কালের পটে। তাল থেকে তালান্তরে, সুর থেকে সুরান্তরে, রস থেকে রসান্তরে এগিয়ে চলা, গল্পের চরিত্র অনুসরণ করে লয়ের পরিবর্তন, একই তালের বিভিন্ন অংশে ছন্দ বদল, ছন্দ বৈচিত্র-পরিবর্তন-মিলন, আবৃত্তি-অভিনয়-কথোপকথন - এইগুলিই পদাবলী ও লীলা কীর্তনের প্রধান উপকরণ। আমরা শ্রোতার দল উপভোগ করতে লাগলাম ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে থাকা সেই লীলা। লীলাই বটে - এই দুই গায়ক-বাদক যেন খেলাই করছেন আর অহৈতুক এই লীলার জগতে আমাদেরও করে নিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গী।

ছোট করে গৌরচন্দ্রিকা সেরে গায়ক শুরু করলেন ১৪ মাত্রার বড় তেওট তালের গান গোষ্ঠলীলা। কৃষ্ণ মা যশোদার কোলে বসে বলছেন, 'মাগো এখন সাজাও আমায় সখা সঙ্গে গোষ্ঠে যাব'। দুই মাত্রার 'জোড়'-এ 'মাগো এখন' গেয়ে ৪।৪।৪ ভাগে ১২ মাত্রার ওপর বিন্যস্ত হল 'সাজা -ও আ- মায়। স- খা- স- ঙ্গে-। গো- -ষ্ঠে -যা ব-'। কীর্তনাঙ্গীয় তালে এই 'জোড়'-এর একটি বিশেষ ভুমিকা আছে - জোড়ই জোড়যুক্ত তালের প্রাণমুহূর্ত। ঘুরে ফিরে ওই দুই মাত্রার মুখটা আসে আর তার পরে বাকি বারো মাত্রার খোলের ছন্দ বদল হয়ে কখনো

হয় ৪।৪।৪-এর ওপর ৬।৬।৬, কখনো ৮।৮।৮। লয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ১৪ মাত্রা রূপ পেতে থাকে ৭মাত্রার জমাট ১। ২। ২।২ আবর্তনের। একই পদ আবর্তিত হতে থাকে ক্রমশ বেড়ে চলা লয়ের সঙ্গে আর শ্রোতারা সেই উন্মাদনায় ঢুকে পড়েন গানের শরীরে। অভিনয়, কথোপকথন, আবৃত্তি সবই হয়ে ওঠে এই গানের অঙ্গ। মা-বেটা যখন কথা চলছে, সে গান নিল ৩-এর ছন্দে ৬ অথবা ১২ মাত্রার আবর্তনের লোফা তালের রূপ। দোহন পর্ব সারা হলে কৃষ্ণর দাদা বলরামকে গানের মূল বিষয় করলেন গায়ক। শ্রোতাদের মন ধরে রাখতে সরলরৈখিক গল্প বলার পারম্পর্য থেকে সরে এসে গল্প অন্য এক রাস্তায় এগোতে শুরু করল। তাঁর যে মধু পান করার অভ্যাস ছিল বলরামের সেই মত্ত দশাটি কাজে লাগিয়ে গানে ওই ৩-র ছন্দই প্রকাশিত হ'ল বলরামের নিয়ন্ত্রণহীন 'উলোটি-পালোটি' চলন। তারপর বলরামের মুখ থেকে 'যেন মধু ঝরিছে'-র বর্ণনা : শ্বেতকমল থেকে হৃদয়কমল, হৃদয়কমল থেকে নাভিকমল, নাভিকমল থেকে চরণকমল, 'কমলে কমল মধু বিনিময়' -এর সুরময় আন্দোলন - আসরের মেজাজে এখন এক ভেসে বেড়ানো কৌতুকের প্রাধান্য। এই অবস্থায় সকাল বেলা বলরাম ভাইকে আনতে চলেছেন পুব থেকে পশ্চিমে, গায়কের বর্ণনায় সেই বলরাম জীবন্ত হয়ে উঠছেন শ্রোতার কাছে। শ্রোতারা গায়কের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন বলরামের সামনে রাস্তার উপর তাঁরই দীর্ঘ ছায়া, বলরাম সেই ছায়াকেই দেখলেন তাঁর শত্রু হিসেবে, সে যেন তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়ে। শুরু হ'ল নিজেরই ছায়ার সঙ্গে তাঁর কথপোকথন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। আর তখনই তাল- ছন্দ বদলে গান শুরু হ'ল - 'নিজ অঙ্গ ছায়া হেরি বলাইদাদা রুখে দাঁড়াল'। সমমাত্রার ৩।৩ অথবা ৪।৪ বিভাগের তালে এই ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাই রুখে দাঁড়ানোর মেজাজটা জোর পেল ৭ মাত্রার দু ঠুকি তালের ৩।৪ বিভাগেঃ ব লা ই। দা - দা - / রু খে দাঁ। ড়া - ল - ইত্যাদি। আবার, বলরাম যে তোতলা ছিলেন সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে ৩-এর ছন্দে রচিত হ'ল 'কাকাকা কাকাকা কানাইয়া কানাইয়া ঘনঘ নঘন ডা-কে'। গল্প আবার ফিরে এল কৃষ্ণ আর যশোদার ঘরে : একদিকে বাৎসল্য রসের টান আর অন্যদিকে সখ্য রসের।

প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা গান হবার পর এই অংশ শেষ করে গায়ক জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ গো ক'টা পর্যন্ত হবে গো ?, এখন পৌনে পাঁচটা', আয়োজক উত্তর দিলেন, 'পাঁচটা'। 'ও, তাহলে তো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়'। এবার শুরু হল মিলন অংশ : রাধারাণীর আবির্ভাব ও এই প্রথম গানে ৪। ৪ ছন্দের প্রয়োগ। এতক্ষণ পর্যন্ত বাৎসল্য আর সখ্য রসের টানাটানি ছিল, 'মা টানে ঘর পানে, রাখাল টানে বন পানে', এখন এর সঙ্গে যুক্ত হল মধুর রস, 'রাই টানে নয়নে, নয়নে, নয়নে গো'। ফিরে এল দু ঠুকি তালের ৩। ৪-এর ঝোঁক। মা আর

রাখালের টানের সাঙ্গীতিক রূপ পেল এই ৭ মাত্রার তালের দুই দুই করে চার আবর্তন : মা - -। টা - নে - /ঘ - র। পা - নে -, আর রাইয়ের টান পেল একাই চার আবর্তন : রা ই টা নে/ ন - - । য় - নে -/ন - - । য় - নে -/ন - -।য় - নে -/ গো - -। রা ই টা নে ...। কত আদরে কত নরম করে ফিরে ফিরে, নানান ভাবে এই পদ গেয়ে চললেন গায়ক : কি তার মাধুর্য! ২০-২৫ মিনিটে মিলন পর্ব শেষ করে রাধাগোবিন্দ মিলন দিয়ে এই গান শেষ হল। গান শেষ হ'ল অথচ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে কোন অসম্পূর্ণতার বোধ রইল না। গায়ক ঐটুকু সময়েই গান শেষ করলেন আর তার মধ্যেই গান পূর্ণতা পেল। এও এই সঙ্গীতচর্চার বৈশিষ্ট্য : যাঁরা গান-বাজনা চর্চা করেন তাঁরা জানেন কত সাধনা, কত চর্চা, কত অভিজ্ঞতার পর শিল্পী অর্জন করেন এই ক্ষমতা!

চার

একই সময়ে একই কলেজে পড়ার সূত্রে মিত্র ঠাকুর বাড়ির সন্তান মিলন মিত্র ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগ ঘটেছিল। সেই বন্ধুত্ব আর গান-বাজনার টানে আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ময়নাডালে নন্দোৎসবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই স্মৃতি অনেকটাই আবছা হয়ে এসেছিল তবে দ্য ট্রাভেলিং আর্কাইভের মধ্যস্থতায় মিলনের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হ'ল। আমি গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসি জানে বলে কিছুদিনের মধ্যেই মিলন আমাকে ময়নাডালের গোবিন্দগোপাল ও নবগোপাল মিত্র ঠাকুরের গানের রেকর্ডিং শোনালো। এই রেকর্ডিং করেছিলেন দেবেন ভট্টাচার্য ১৯৫৪ সালে কীর্তনের এক আসরে। তারই একটি অংশ এল. পি. রেকর্ড হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিস থেকে। বার বার সেই গান আর খোল শুনছি আর মুগ্ধ হচ্ছি গোবিন্দগোপালের উচ্চারণের শুদ্ধতা, কণ্ঠধ্বনির ওজন আর গভীরতায়। প্রেমের সততা, তত্ত্বের অধ্যয়ন, শাস্ত্র পাঠ, সাহিত্য চর্চা, কাব্য রসের বোধ, গল্পবলা-অভিনয়-নাচের শিক্ষা, সঙ্গীতের নির্দিষ্ট ঐতিহ্যগত চর্চা না থাকলে কীর্তন গাওয়া সম্ভব নয়, না সম্ভব ঐ রকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া। গায়করা যে আখরের ও খোল বাদকরা যে কাটানের পরিসর পান, তা তো একেবারে নিজের রসবোধ দিয়েই ভবতে হয়। এই রসবোধের জন্ম দিতে পারে অন্যান্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত এক সহজ জীবন যাপন - বেশভূষা, খাদ্যাভাস, মাছ ধরা, গাছে চড়া, দোহন, উপাসনা ইত্যাদি পর্যন্ত যা বিস্তৃত। মিলনের কাছে শুনলাম আমি যখন ময়নাডাল যাই তখন এঁদের গান আমি সামনাসামনি শুনেছি। স্পষ্ট মনে করতে পারিনা সে-কথা এখন তবে এ-কথা জেনে আজও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

পারিবারিক সূত্রে কীর্তনের সঙ্গে আমার একটি যোগ আছে। বাবার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বাবা নিজে ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত খোল বাদক। প্রত্যেক ছুটিতে সপরিবারে

বাবা বাড়িতেই কাটাতেন। গরমের ছুটিতে আমাদের বাড়ির কাছেই মদনমোহন মন্দিরে চব্বিশ প্রহরের আয়োজন হত। ছোটবেলায় অনেকবারই এই উৎসব দেখবার-শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় মদনমোহন মন্দিরের সামনে মঞ্চের ওপর কাঠের গৌর-নিতাইয়ের মূর্তিকে ঘিরে নাম কীর্তন চলছে। তখন একটু বড় হয়েছি, সামান্য একটু আধটু খোল বাজাতে শিখেছি, দাঁড়িয়ে সেই গান-বাজনা শুনছি। হঠাৎ আমারই কাছাকাছি বয়সের এক বন্ধু তার কাঁধের খোলটা আমাকে দিয়ে বলল, 'বাজা'। যে গান চলছিল তার সঙ্গে খোল বাজানো আমার কাছে কঠিন কাজ ছিল না। কাঁধে খোল নিয়ে ভিড়ে গেলাম নাম কীর্তনের দলের সঙ্গে। এক পাকও মারিনি, খেয়াল করলাম নিজের বাজনা নিজেই শুনতে পাচ্ছি না। অথচ কি আশ্চর্য, আমার সঙ্গে আমারই কাছাকাছি বয়সের যারা খোল বাজাচ্ছিল প্রত্যেকের বাজনা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা কেউই পেশাদার খোল বাদক নয়, কেউ চায়ের দোকান চালায়, কেউ খায় দুধ বেচে তো কেউ রোজগার করে শাঁখার কাজ করে অথচ কীর্তন তাদের জীবনের অঙ্গ। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলাম ঐতিহ্যের পরম্পরা একবার বিঘ্নিত হলে সেই পরম্পরা সচলতা হারায়। আধুনিকতাবাদের উন্মাদনায় যখন ঐতিহ্যকে বর্জন করাই এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়, পরম্পরা ক্রমশ তখন এক প্রাণহীন অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। জীবনযাপনে-দর্শনে-আচরণে যদি পরম্পরার মালা ছিঁড়ে যায়, তাহলে পরম্পরাগত শিল্পকে সংরক্ষণ করা হয়ত সম্ভব কিন্তু সজীব রাখা সম্ভব হয় না। তখন এ-গান টিকে থাকতে পারে কেবলমাত্র এর নিস্তেজ,যান্ত্রিক উপস্থাপনার মধ্যে - যেমন ঘটেছিল নাম কীর্তনের সঙ্গে আমার খোল বাজনায়, যেমন শুনেছিলাম ত্রনধিয়ামের রাস্তার ধারে, যেমন শোনা যায় একো-সর্বস্ব, মাইকে চেঁচানো 'আধুনিক' কীর্তন গানে।

মে ২০১৬

এই প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নিয়েছি,

১। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন*, বিশ্ববিদ্যা সংগ্যহ, বিশ্বভারতী। কলকাতা, ১৯৪৫

২। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*, সি.এস.এস.এস.ও কে পি বাগচী কলকাতা, ১৯৮৯

৩। মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক। কলকাতা, ১৯৯৫

৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *কার মিলন চাও বিরহী : মানুষের ধর্মসংকট*, বাউল মন। কলকাতা, ২০০০

৫। মিলন মিত্র ঠাকুর [সম্পাদক], *মালঞ্চ*, প্রথম সংখ্যা। ময়নাডাল, ২০১৪